সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০১)

নজরুলের বই-উৎসর্গপত্র

আবু হেনা আবদুল আউয়াল*

আধুনিককালে উৎসর্গপত্র গ্রন্থের একটি অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যতদূর জানা যায়, বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)-ই গ্রন্থের উৎসর্গপত্র প্রবর্তন করেন (১৮৬০)। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) অসংখ্য গ্রন্থের উৎসর্গপত্র রচনা করেন। উৎসর্গপত্র রচনা বা গ্রন্থ উৎসর্গকরণে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)ও কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। প্রথম গ্রন্থ *ব্যথার দান* (১৯২২) থেকেই তিনি উৎসর্গপত্র রচনা শুরু করেন। তাঁর সক্রিয় জীবদ্দশায় প্রকাশিত পঞ্চাশটি গ্রন্থের মধ্যে ছাব্বিশটি গ্রন্থের উৎসর্গপত্র রচনা করেন তিনি।

গ্রন্থ উৎসর্গের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকে লেখকের রুচিবোধ ও আদর্শ চেতনা। তাঁর প্রীতি, শ্রদ্ধা, সম্মান ও স্নেহ কার প্রতি তা উৎসর্গপত্রে বিধৃত হয়। অনেক সময় উৎসর্গপত্রে তার কার্যকারণ সম্পর্কও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। লেখকের জীবন, সমাজ ও সাহিত্য দৃষ্টির ধ্রুপদী সাক্ষাৎ মেলে এ উৎসর্গপত্রে। লেখক অত্যন্ত ভেবে-চিন্তেই তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের মানসচেতনা উদ্‌ঘাটনে ও উপলব্ধিতে তাঁর উৎসর্গপত্র সবিশেষ সহায়ক। মধুসূদনের উৎসর্গপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কৃতজ্ঞমনের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশির ভাগ গ্রন্থই তাঁর পরিবার ও সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। অন্যদিকে নজরুলের উৎসর্গপত্রে প্রধানত তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃতজ্ঞ মনের স্বাক্ষর উৎকীর্ণ হয়েছে।

নজরুলের উৎসর্গপত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখি তিনি তাঁর সমসাময়িক ভারতের স্বাধীনতা- সংগ্রামী, বিপ্লবী, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ প্রমুখের নামে উৎসর্গপত্র রচনা করেছেন। রফিকুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন,

> নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থ যাদের উৎসর্গ করা হয়েছিল নজরুল তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, অনুরাগের বিচিত্র সম্পর্কে; আনন্দ ও বেদনায়, সুখ ও দুঃখে নজরুল যে-সব মানুষের সঙ্গে জীবন-যাপন করেছেন তাদের উদ্দেশে তিনি তাঁর সৃষ্টির সম্ভার নিবেদন করেছেন। এর থেকে শুধু কবি, গীতিকার বা কর্মী নজরুলের চেয়েও মানুষ নজরুল ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভুবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক অর্থে, ঐ মানুষেরাই নজরুলের জীবনের নায়ক–নায়িকা; আবার ঐ সব মানুষের নায়ক নজরুল।[১]

কোনো কোনো উৎসর্গপত্রে প্রশস্তিসূচক বা শ্রদ্ধামূলক কথা বা কবিতাও জুড়ে দিয়েছেন তিনি। সেই কথা বা কবিতা থেকে এক উৎসর্গপত্রের থেকে আরেক উৎসর্গপত্রের আবেগ-আর্তির তারতম্যও আঁচ করা যায়। যাঁদের নামে ও যে ভাষায় তিনি গ্রন্থের উৎসর্গপত্র রচনা করেছেন আমরা এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

---

* কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ব্যথার দান

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রথম গ্রন্থ *ব্যথার দান* (মার্চ ১৯২২) উৎসর্গ করেন স্কুল-জীবনের মানসী স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি ছিলেন রাণীগঞ্জ থানার পুলিস অফিসার অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। নজরুল রাণীগঞ্জে সিয়ারশোল হাই স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়াকালে (১৯১৭) স্থানীয় জগন্নাথ গার্ডেনে তাকে প্রথম দেখেন। পরে তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু এ কৈশোরিক সম্পর্ক বেশীদূর এগুতে পারে নি। ধর্ম, বয়স ও বাস্তব অবস্থা এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নজরুলের স্মৃতিতে অম্লান ছিল এই প্রীতি। বিষয়টি নজরুল-জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকলেও তা অনেকাংশে অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হয়ে আছে। কি রকম আবেগ থাকলে ঐ ঘটনার অনেক দিন পরেও তার উদ্দেশে গ্রন্থ—তাও প্রথম গ্রন্থ, উৎসর্গ করা যায় তা ভাববার বিষয়। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন,

> মানসী আমার!
> মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে
> ক্ষমা করনি,
> তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
> প্রায়শ্চিত্ত করলুম।

এখানে উল্লিখিত মাথার কাঁটাটি তিনি অনেক দিন সংরক্ষণ করেছিলেন। করাচী-ফেরত নজরুলের দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে এ কাঁটাটিও ছিল।[২]

অগ্নি-বীণা

নজরুল তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ ও প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নি-বীণা* (অক্টোবর ১৯২২) উৎসর্গ করেন শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ (১৮৭০-১৯৫৯)কে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন অগ্নি-যুগের (১৯০০-১৫) বিপ্লবী গুপ্ত দলের অন্যতম আদি অগ্নিকর্মী। কলকাতা, আসাম ও উড়িষ্যায় তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। তিনি পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্যে ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)ও প্রফুল্ল চাকীকে (১৮৮৮-১৯০৮) মুজফ্ফরপুরে তিনিই পাঠান।[৩] বিপ্লবের বাণী প্রচারের জন্যে ১৯০৬ সালে তিনি *যুগান্তর* পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। মুরারী পুকুরের বাগান বাড়িতে তিনি বোমা তৈরির ফ্যাক্টরি গড়ে তোলেন। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়ে (১৯০৮) তিনি বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করেন। বিচারে প্রথমে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ হয় ও পরে আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ পান। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯২০ সাল (ডিসেম্বর) পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। মুক্তির পর কিছুদিন পণ্ডিচেরীতে বড়ভাই শ্রীঅরবিন্দের (১৮৭৫-১৯৫০) আশ্রমে থাকেন ও *বিজলী* (১৯২০) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এ সময়ই তাঁর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে।

নজরুল একই সময় 'অগ্নি-ঋষি' (তিলক কামোদ ঝাঁপতাল) শিরোনামে তাঁকে উদ্দেশ্য করে একটি গান লেখেন। গানটি ১৩২৮ (১৯২১) সালের *উপাসনা* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৪] এ গানটিই উৎসর্গপত্রে সম্বোধন অংশের নিচে সংযোজিত হয়। উৎসর্গপত্রে সম্বোধন অংশে নজরুল লেখেন,

ভাঙ্গা বাঙ্লার রাঙা যুগের আদি পুরহিত, সাগ্নিক বীর
শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্রী শ্রী চরণারবিন্দেষু-

এর পরে সংযোজিত চৌদ্দ পংক্তির গানটিতে নজরুল বারীন্দ্রকুমারকে 'অগ্নি-ঋষি' ও 'দুর্বাসা' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর প্রথম অংশে তিনি লিখেছেন,

অগ্নি-ঋষি, অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে,
তাই ত তোমার বহ্নি রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে ॥
দহন-বনের গহণ-চারী
হায় ঋষি-কোন্ বংশী ধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি অগ্নি-মরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন্ বাঁশি সে বুঝতে পারি না যে ॥

যুগবাণী

যুগবাণী (অক্টোবর ১৯২২) গ্রন্থটি নজরুল বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্র লেখেন,

শ্রী বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীচরণেষু
তোমার আদর সিক্ত ছোট ভাই,
নূরু।

নজরুল ১৯২১ সালে (এপ্রিল) আলী আকবর খানের (১৮৯৫-১৯৭৭) সঙ্গে কুমিল্লার কান্দির পাড়ে আলী আকবরের সহপাঠী বীরেন্দ্রের বাসায় ওঠেন। এখানে আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলও বীরেন্দ্রের মা বীরজা সুন্দরী দেবীকে (মৃ. ১৯৩৮) 'মা' বলে সম্বোধন করেন এবং বীরেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। এর পরেও তিনি কয়েকবার সে-বাড়িতে আসা-যাওয়া করেন ও তার চাচাতো বোন দুলি তথা আশালতা সেনগুপ্তার (১৯০৮-৬২) প্রতি অনুরক্ত হন। এ সম্পর্ক সূত্রে নজরুল সে-সময়ে প্রকাশিত তাঁর *যুগবাণী* গ্রন্থটি বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করেন।

বিষের বাঁশী

হুগলীর আরামবাগস্থ শেখরপুর গ্রামে ১৮৮৪ সালে মোসাম্মৎ মাসুদা খাতুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হুগলী জজ কোর্টের সরকারি উকিল খান বাহাদুর মাযহারুল আন্ওয়ার চৌধুরী। পিতা মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা বিরোধী ছিলেন বলে তিনি বাল্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। তবে বাড়ির হিন্দু সরকার ও চাচাতো ভাইয়ের সহায়তা নিয়ে নিজের চেষ্টায় বাংলা শেখেন। জীবনের বাস্তব নির্মম অভিজ্ঞতা তাঁর মনে বিদ্রোহী ভাবের জন্ম দেয় এবং লেখনীর মাধ্যমে তিনি তা প্রকাশের চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বাল্যে শিক্ষা পাইনি, দুঃখ-বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণের চকমকিতে আগুন জ্বলেছে, সময় সময় বালিকার মুখে তারই ফুলকী ফোটে বেরোয় মাত্র।"[৫]

শ্রীরামপুরের সাব-রেজিস্ট্রার কাজী মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে বিয়ে-সূত্রে তিনি 'মিসেস এম, রহমান' নামে লেখালেখি করেন এবং এ নামেই পরিচিত হন।

তিনি বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) ও কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। *নবনূর* (১৯০৩) পত্রিকায় বেগম রোকেয়ার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রিকায় নজরুলের লেখা পাঠের সুযোগে তাঁর মধ্যে এ প্রভাব কার্যকরী হয়। তাঁদের লেখা পড়ে ও নিজের জীবন অভিজ্ঞতায় তিনি সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, পুরুষ-শাসিত ও মোল্লা-প্রভাবিত সমাজে নারীরা অবরুদ্ধ। তাই লেখনী ও সামাজিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তিনি নারীমুক্তির বাণী ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস পান।

তাঁর প্রথম লেখা *মা ও মেয়ে* উপন্যাসটি ইমদাদ আলী খান-সম্পাদিত *সহচর* (জানুয়ারি, ১৯২২) পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩২৯) হতে চতুর্থ সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৩০) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। এছাড়া *মোহাম্মদী* (১৯০৩) *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা* (১৯১৮) *সওগাত* (১৯১৮) *বিজলী* (১৯২০), *ধূমকেতু* (১৯২২), *সাম্যবাদী* (১৯২৩) *আত্মশক্তি* (১৯২৫), *লাঙল* (১৯২৫) প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত দশটি প্রবন্ধ নিয়ে *চানাচুর* (১৯৩৫) নামক প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি কখন কিভাবে পরিচিত হন তার সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, লেখালেখি-সূত্রেই নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এ রকম কথাই লিখেছেন, মিসেস রহমান ছিলেন লেখিকা, তৎকালীন *সুলতান* প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লিখতেন। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয়।[৬] নজরুলের স্বত্বাধীনে ও সম্পাদনায় অর্ধ সাপ্তাহিক *ধূমকেতু* (১১ আগস্ট ১৯২২) বের হলে মিসেস এম, রহমান ৭১ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন,

> শ্রদ্ধাস্পদ ধূমকেতু সারথি। অনেক দিন আগে আমি আপনাকে খেতাব দিয়েছিলাম 'বাঁধন-ছেঁড়া'। আজ দিলাম 'সত্য সাধক'। সত্যের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করুন। ইহাই প্রার্থনা। মিসেস এম, রহমান।[৭]

এ অভিনন্দন বাণীর ভাষা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নজরুলের সঙ্গে পূর্বেই তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁর *বাঁধনহারা* (১৯২৭) সূত্রেই তাঁকে 'বাঁধন–ছেঁড়া' খেতাব দিয়েছেন কৌতুক ছলে। উল্লেখ্য যে, নজরুলের *বাঁধনহারা* পত্রোপন্যাসটি ১৯২০-২১ সালে *মোস্‌লেম ভারত* (১৯২০) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উক্ত অভিনন্দন বাণী ছাড়াও *ধূমকেতুতে* তাঁর চারটি লেখা প্রকাশিত হতে দেখা যায় : 'আমাদের অভাব অভিযোগ'[৮] 'আমাদের দাবী'[৯] 'আমাদের স্বরূপ'[১০] ও পাঁচমিশালী'[১১]। এগুলোতে অত্যন্ত জোরালোভাবে তিনি নারীদের অভাব-অভিযোগ বা দাবি-দাওয়ার কথা তুলে ধরেছেন; যেমন, 'আমাদের অভাব অভিযোগ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> আমরা পুরুষকে ব্যক্তিভাবে পতি, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্ররূপে, ভালবাসবো, সমষ্টিরূপে তাদের সঙ্গে [বিরুদ্ধে] বিদ্রোহ করবো। ভাল জিনিস কেউ কখনও হাতে তুলে দেয় না, যখনই হোক জোর করেই কেড়ে নিতে হবে। ইসলাম ধর্মে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান লাভ অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট। তবে

কেন আমরা তাহা থেকে বঞ্চিত ? আমরা চাই আমাদের ধর্ম মত প্রাপ্য অধিকার ও স্বাধীনতা, যা থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমরা চাই আমাদের ব্যক্তিত্বের স্বীকার, চাই আমাদের নারীদের সম্মান।

এ থেকে এম, রহমানের মানস-চেতনা সহজেই আঁচ করা যায়।

*ধূমকেতু*র ষোড়শ সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, পতিতাদের ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের জন্যে গঠিত 'বালারুণ সম্প্রদায়'-এর একজন সংগঠক ও সদস্য ছিলেন তিনি।[১২] এ সংগঠনের অন্য সদস্যারা হলেন শ্রীযুক্ত স্নেহলতা দেবী, শাহজাদী আশরাফুন্নেছা বেগম, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা বিশ্বাস ও বেগম রোকেয়া।

নজরুল রাজবন্দি হয়ে বহরমপুর জেলে থাকাকালে (১৮২৩) মিসেস এম, রহমান তাঁকে গোপনে চিঠি লিখতেন ও মাঝে মধ্যে সুস্বাদু খাবার পাঠাতেন বলে জানা যায়।[১৩] পরবর্তীকালে আশলতা সেনগুপ্তাকে বিয়ের (২৪ এপ্রিল ১৯২৪) ব্যাপারে তিনি নজরুলকে সাহস ও সর্ববিধ সহযোগিতা দান করেন। শুধু তাই নয়, সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা–বিঘ্ন উপেক্ষা করে তিনি নজরুলের বিয়ের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন।[১৪] উল্লেখ্য, এ বিয়েতে হিন্দু, ব্রাহ্ম ও মুসলমানদের গোঁড়া ও রক্ষণশীল অংশ পূর্ব থেকেই আপত্তি করে আসছিল। মিসেস এম, রহমানের সঙ্গে মঈন উদ্দীন হোসায়নও ছিলেন এ বিয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং তিনিই এ বিয়ের আক্‌দ করেছেন। এ বিয়ের কারণে হুগলীতে গোঁড়া হিন্দু-মুসলমানরা তাঁকে বাসা ভাড়া দিতে অসম্মতি জানায়। বিপ্লবী যুবকদের বিশেষ করে বিপ্লবী বীরেন ঘোষের চেষ্টায় তিনি হুগলীতে বাসা পান। হুগলীতে বাসা পাওয়া ও সংসার পাতার ব্যাপারে মিসেস এম, রহমানও তাঁকে আপ্রাণ সহযোগিতা করেন। এসব কারণে তাঁর প্রতি নজরুলের কৃতজ্ঞতা বেড়ে যায় এবং তিনি তাঁকে মাতৃজ্ঞান করতে থাকেন। এর কমাস পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *বিষের বাঁশি* (আগস্ট ১৯২৪) মিসেস এম, রহমানকে উৎসর্গ করেন।

মিসেস এম, রহমান ও নজরুলের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্যে, অথবা মিসেস এম, রহমানের প্রতি নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা বোঝার জন্যে উৎসর্গপত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎসর্গপত্র রচনায় নজরুলের শ্রম ও আন্তরিকতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

এ উৎসর্গপত্রটি দুঅংশে বিভক্ত : গদ্যে রচিত সম্বোধন অংশ ও কবিতায় রচিত পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা অংশ। সম্বোধন অংশে মিসেস এম, রহমানের মূল বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক পরিচয় ও তাঁর প্রতি নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে।

> বাঙলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলা-কুলগৌরব
> আমার জগজ্জননী স্বরূপ।
> মা মিসেস এম, রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে-

চুয়াল্লিশ পংক্তি বিশিষ্ট এ দীর্ঘ কবিতায় নজরুল মিসেস এম, রহমানকে 'নাগমাতা' ও নিজেকে 'নাগশিশু' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, সর্বনাশের ঝাণ্ডা উড়িয়ে বিপ্লব করার সেই অগ্নি সময়ে তিনি বিপ্লবীদের প্রেরণা দিয়েছেন। বিপ্লবীরা তাঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেছেন। নজরুলকেও তিনি তাঁর অপার মমতা, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন। নজরুল কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করেছেন।

তিনি বলেছেন, শুধু তাঁর জননী নন, তিনি নিখিল জননীও। কারণ, তাঁর ভালোবাসা ছিল সকল পীড়িতের প্রতি সমান ও অকৃপণ। তিনি তাঁর প্রতি হৃদয়-নিঃসৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন,

তোমার মমতা-মানিক আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা,
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্বজননী। তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে, বিষ শুধু তোমা দহে,
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর তার বহে।

উৎসর্গপত্রটি তিনি হুগলীতে বসে রচনা করেন। রচনাকাল ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৬ শ্রাবণ।

১৯২৬ সালের ২০ ডিসেম্বর এই প্রগতিবাদী নারী ও মাতৃস্বরূপার অকাল মৃত্যুতে নজরুলের পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণনগর থেকে *সওগাত*-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪)কে প্রেরিত পত্রে ও 'মিসেস এম, রহমান' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতায় নজরুলের মানসিক অবস্থা ও মিসেস এম, রহমানের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রদ্ধা পুনঃ অভিব্যক্ত হয়েছে।

ভাঙার গান

কারামুক্তির পর (১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৩) নজরুল মেদিনীপুরের সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে মেদিনীপুরবাসী নজরুলকে পৃথকভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ঐ সভায় তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় স্কুল শিক্ষকের মেয়ে কমলা গলার হার খুলে তাঁকে উপহার দেয়। এ ঘটনায় লোকগঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে ঐ মেয়ে আত্মহত্যা করে।

এর ক'মাস পরে প্রকাশিত (আগস্ট ১৯২৪) *ভাঙার গান* গীতিগ্রন্থটি নজরুল "মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে" উৎসর্গ করেন। " [...] কিন্তু সেইটেই এ গ্রন্থ উৎসর্গের কারণ নয়। ইংরেজ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবে অবিভক্ত বাংলায় মেদিনীপুর ছিল অগ্রণী। এক মেদিনীপুর জেলা থেকে যত যুবক ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন আর কোনো জেলা থেকে তা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনে নজরুলের 'ভাঙার গান' উৎসর্গ হয়েছিল মেদিনীপুরবাসীর বিপ্লবী চেতনার উদ্দেশে।"[১৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫-১১) ও খিলাফত–অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) মেদিনীপুরবাসী বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। এর পূর্বেও ইতিহাসে তাদের বিপ্লবী ভূমিকার কথা উল্লিখিত আছে। স্বদেশী আন্দোলনে ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)সহ বেশ কিছু যুবক ফাঁসির মঞ্চে জীবনোৎসর্গ করেন।

ছায়ানট

সন্দ্বীপের মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (১৮৮৯-১৯৭৬) ১৯১৩ সাল থেকে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র(১৯২৩) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যুক্ত হন। ১৯১৯ সাল

থেকে তিনি ঐ সমিতির মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি পত্রিকার* (১৯১৮) সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করতে থাকেন। এর পূর্বে তিনি ১৯১৬ সালে কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।

কাজী নজরুল ইসলাম করাচী সেনানিবাস থেকে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা*সহ কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠাতে থাকেন। তাঁর প্রেরিত 'ক্ষমা' কবিতাটি মুজফ্ফর আহ্মদ 'মুক্তি' নাম দিয়ে সাহিত্য সমিতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। এতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে করাচী থেকে পত্রিকা-সম্পাদককে পত্র লেখেন (আগস্ট ১৯১৯) এরপরে নজরুলের প্রেরিত "ব্যথার দান" গল্পের 'লাল ফৌজ' শব্দটি কেটে মুজফ্ফর আহমদ 'মুক্তি সেবকের দল' বসিয়ে গল্পটি সাহিত্য সমিতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 'লাল ফৌজ' শব্দটি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার সহ্য করতে পারতেন না; ফলে নজরুলের ক্ষতি হতে পারে— এ বিবেচনায় তিনি এ পরিবর্তন করেন।[১৬]

১৯২০ সালের প্রথম দিকে সাত দিনের ছুটিতে এসে নজরুল চারদিনের মতো মুজফ্ফর আহমদের মেসে থাকেন। সেবারই মুজফ্ফরের সঙ্গে তাঁর প্রথমে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। এ পরিচয় ও বন্ধুত্ব আমৃত্যু অক্ষুণ্ন থাকে।

ক'মাস পর ৪৯ নং বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে (মার্চ ১৯২০) নজরুল কলকাতায় চলে আসেন। ক'দিন বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-৭৬) বোর্ডিং (রামকান্ত বোস স্ট্রীট, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট)-এ থেকে মুজফ্ফর আহ্মদের মেসে ওঠেন। এখানে তিনি মুজফ্ফরের কক্ষবাসী হন। এখানে পূর্ব থেকেই কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৬-১৯৭০) ও আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০) অবস্থান করছিলেন। মেসের সাহিত্যিক পরিবেশ তাঁর জন্যে উপকারী হয়েছিল। এ বছরই মে মাস থেকে মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) সম্পাদনায় *মোসলেম ভারত* বের হতে থাকে। তাতে নজরুলকে নিয়মিত লেখাঁর সুযোগ দেয়া হয়। সম্পাদকরূপে মোজাম্মেল হকের নাম থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছেলে আফজাল-উল হকই তাঁর মেস থেকে এটি সম্পাদনা করতেন। পরের মাস (জুলাই) থেকে মুজফ্ফর আহ্মদ ও নজরুল এ.কে. ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) সান্ধ্য দৈনিক *নবযুগের* যুগ্ম-সম্পাদকরূপে কাজ করতে থাকেন। এসময় মুজফ্ফর আহ্মদ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। নজরুলও তাঁর সঙ্গে ছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি পার্টির সদস্য হন নি।[১৭]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে (আগস্টে) নজরুল *ধূমকেতু* বের করলে মুজফ্ফর আহ্মদ তাতে 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা ও কৃষক-শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে নিবন্ধ লেখেন।

১৯২০-২১ সাল থেকে ভারতে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। মুজফ্ফর আহ্মদ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই সরকার ১৯২৩ সালের ১৭ মে তাঁকে গ্রেফতার করে। পরের বছর কানপুর বলশেভিক মামলায় তাঁকে আসামি করা হয়। মামলার বিচারে তাঁর চার

বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[১৮] কারাগারে তাঁর শরীর ভেঙে যায় ও ক্ষয়রোগ দেখা দেয়। জেলেই মৃত্যু হতে পারে আশঙ্কায় সরকার তাঁকে মেয়াদ পূর্তির আগেই মুক্তি দেয়। এই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও অন্য বিপ্লবী রাজনীতিক কুতুব উদ্দীন আহ্‌মদ (মৃ.১৯৪৮)কে নজরুল এই সময়ে প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর ১৯২৫)তাঁর *ছায়ানট* কাব্যগীতি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। তাতে তিনি লেখেন,

আমার শ্রেয়তম রাজ-লাঞ্ছিত বন্ধু
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
ও
কুতুব উদ্দিন আহ্‌মদ
করকমলে–

উৎসর্গপত্র থেকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুব উদ্দীন আহ্‌মদের বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি নজরুলের সমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে (নভেম্বর ১৯২৫) কুতুবউদ্দিন আহ্‌মদ, শামসুদ্দীন হুসায়ন, আবদুল হালিমসহ নজরুল 'মজুর-স্বরাজ-প্রজা-সম্প্রদায়' গঠন করেন। আরো পরে (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) এ পার্টিকে 'শ্রমিক-কৃষক পার্টি'তে রূপান্তরিত করেন এবং তাতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও যোগদান করেন।

চিত্তনামা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) অকাল প্রয়াণে (১৬ জুন) গভীর শোকাহত নজরুল তাঁকে উদ্দেশ্য করে মাত্র পনর দিনে পাঁচটি কবিতা ও গান রচনা করেন। এগুলোর সংকলন গ্রন্থ *চিত্তনামা* (নভেম্বর ১৯২৫) তিনি চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৭৪)কে উৎসর্গ করেন। এ উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন,

মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রী শ্রী চরণারবিন্দে
নজরুল ইসলাম।

বাসন্তী দেবী চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী হলেও এটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। এ বিদুষী মহিলা তৎকালীন বঙ্গীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৭ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ রাজনীতিতে যোগ দিলে বাসন্তী দেবী তাঁকে পূর্ণ সমর্থন করেন এবং তাঁর সহকর্মীরূপে কাজ করতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি দেশবাসীর সেবায় উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তাও সমর্থন করেন। ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জনের সহযোগীরূপে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ৭ ডিসেম্বর তিনি গ্রেফতার হলেও পরে পুলিস তাঁকে ছেড়ে দেয়। এর তিনদিন পর চিত্তরঞ্জন গ্রেফতার হন। এ সময় চিত্তরঞ্জন দাশের আরব্ধ রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের ভার নেন বাসন্তী দেবী। তারই অংশরূপে চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত *বাংলার কথা* (১৯২১) সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন। তিনি পত্রিকার জন্যে কবিতা চাইতে নজরুলের কাছে পাঠান দাশপরিবারের সদস্য শ্রী সুকুমার দাশকে। নজরুল তাঁকে বসিয়ে রেখে সেই মুহূর্তে লিখে দেন "ভাঙার গান" শীর্ষক বিখ্যাত গানটি। ২০ জানুয়ারি (১৯২২) এটি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাসন্তী দেবী নজরুলকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন এবং নজরুল তাঁর বাড়িতে যান।[১৯] তিনি নজরুলকে তাঁর ছেলের মতো স্নেহ করতেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ জেলে থাকা কালে বাসন্তী দেবী ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৬ সালে একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের (১৮৯৮-১৯২৬) মৃত্যুর পর তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে কবি-জীবনের শুরু থেকেই নজরুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দেবীর মন্তব্য স্মর্তব্য : "[. . .] কাজী নজরুল ইসলাম বাবার বিশেষ অনুগত ছিলেন— ভক্তও ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন।"[২০] রাজনীতিক ছাড়াও চিত্তরঞ্জন ছিলেন একাধারে কবি, লেখক, গীতিকার ও সম্পাদক। *নারায়ণ, বাংলার কথা, ফরোয়ার্ড* (১৯২৩) পত্রিকা সম্পাদনা বা পরিচালনা করতেন তিনি। এসব কারণেও তাঁর সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয়ে থাকবে। ১৯২১ সাল থেকে *নারায়ণ* পত্রিকায় নজরুলের অনেকগুলো গান ও কবিতার প্রকাশ ছাড়াও একাধিক কবিতা ও *বাঁধন-হারা* (*মোস্‌লেম ভারতে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু ১৯২০) ও *ব্যথার দান* (১৯২২) গ্রন্থের প্রশংসাসহ পরিচিতি ছাপানো হয়।

উৎসর্গপত্র থেকে বাসন্তী দেবীর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধার ও সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কই নয়, বরং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও যে উৎসর্গপত্রটি রচনায় সক্রিয় ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সর্বহারা

বিরজা সুন্দরী দেবীর সঙ্গে ১৯২১ সালে (এপ্রিল) কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে নজরুলের পরিচয় ঘটে। আলী আকবর খানের সঙ্গে সে সময়ে তিনি কুমিল্লায় গিয়ে তাঁদের বাসায় ওঠেন ও কিছুদিন অবস্থান করেন। সে সূত্রে বিরজা সুন্দরীই নয়, তাঁদের পুরো পরিবারের সঙ্গেও নজরুলের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আলী আকবর কর্তৃক দৌলতপুরে নজরুলের বিয়ের উদ্যোগানুষ্ঠানে বিরজা সুন্দরী সপরিবারে যোগ দিয়েছিলেন। সে উদ্যোগ ব্যর্থ হলে নজরুল কান্দিরপাড়ে বিরজা সুন্দরীর বাসায় ফিরে আসেন ও কদিন অবস্থান করেন। এ সময়ে এ পরিবারের গিরিবালা দেবীর কন্যা আশালতা সেনগুপ্তার সঙ্গে নজরুলের হৃদ্যতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনি এর পরেও অন্তত চারবার (১৯২১,১৯২২,১৯২৩,১৯২৪) এখানে এসে কিছুদিন বাস করেন।

নজরুলের সম্পাদনায় *ধূমকেতু* প্রকাশিত হলে থাকলে বিরজা সুন্দরী দেবী তাঁকে আশীর্বাণী পাঠান।[২১] নজরুল কারাগারে উনচল্লিশ দিনের মাথায় বিরজা সুন্দরীর হাতে লেবুর শরবত পান ক'রে অনশন ভঙ্গ করেন (২৩ মে ১৯২৩)। এসব থেকে বোঝা যায় বিরজা সুন্দরী ও নজরুলের সম্পর্কের স্বরূপ ও তার গভীরতা। নজরুল আশালতা সেনগুপ্তাকে বিয়ে করলে (এপ্রিল ১৯২৪) অন্যদের সঙ্গে বিরজা সুন্দরীও তার বিরোধিতা করেন। নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবীর জা ছিলেন তিনি। সম্ভবত নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি পরে বিয়ে মেনে নেন এবং নজরুলকে যথাবিহিত স্নেহ করতে থাকেন।

এর বছর দুয়েক পরে ১৯২৬ সালে (জানুয়ারি) প্রকাশিত *সর্বহারা* কাব্যগ্রন্থটি নজরুল বিরজা সুন্দরী দেবীকে উৎসর্গ করেন।

উৎসর্গপত্রটি দু'ভাগে বিভক্ত : সম্বোধন অংশ ও কবিতা অংশ। সম্বোধন অংশ থেকেই বিরজা সুন্দরী দেবীর প্রতি নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। তাতে তিনি লেখেন,

মা (বিরজা সুন্দরী দেবী)
শ্রী চরণারবিন্দে –

এর নিচে হ্যারিসন রোডে ১৬ ভাদ্রে (১৩৩৩) লিখিত একটি কবিতা যুক্ত হয়। তাতে তিনি বিরজা সুন্দরীর মাতৃগুণ ও উদারতার বিস্তৃত বর্ণনা দেন। কবিতাটির শুরুতেই তার পরিচয় মেলে,

সর্বসহ সর্বহারা জননী আমার।
তুমি কোন দিন কারো করনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ।

ঝিঙেফুল

নজরুল তাঁর *ঝিঙে ফুল* (এপ্রিল ১৯২৬) শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন বিপ্লবী বাদলকে (১৯১২-৩০)। তিনি উৎসর্গপত্রে লেখেন,

"বীর বাদলকে।"

বাদল ছিলেন ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের(১৯২১-২২) একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। বিজয় ও দীনেশসহ তিনি ভারতের স্বাধীনতার বেদিমূলে প্রাণোৎসর্গ করেন। বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় এই : আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 'হোঁদল কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন' শীর্ষক কবিতায়ও নজরুল স্বাধীনতার জন্যে বাদলের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন,

বীর বাদল সে-দেশের তরে প্রাণ দিতে ভাই যে শিখে,
আনবে যে সাত-সাগর-পারের বন্দিনী দেশ-লক্ষ্মীকে।

বাঁধন–হারা

বাঁধন-হারা উপন্যাসটি ১৯২০ সালে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৯২৭ সালে (আগস্ট)। তিনি এটি উৎসর্গ করেন নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪)কে। নলিনীকান্ত ছিলেন একাধারে গায়ক, সম্পাদক ও সাহিত্যিক। ১৯২০-২১ সালে *বিজলী* পত্রিকার অফিসেই নজরুলের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় এবং তা আজীবন অক্ষুণ্ন থাকে।

নজরুল কারাগারে অনশন করলে নলিনী উদ্বিগ্ন হয়ে অনশন ভাঙাতে যান। অবশ্য কারা-কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নলিনী ও নজরুল একত্রে যোগ দিতেন ও সংগীত পরিবেশন করতেন। নলিনী হাসির গান গেয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেন। নজরুলের উৎসর্গপত্র থেকে তাঁদের সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। এ উৎসর্গপত্রটিও দু' অংশে বিভক্ত : প্রথম অংশে সম্বোধন ও দ্বিতীয় অংশে কবিতা। সম্বোধন অংশে নজরুল লেখেন,

'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু-"

দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ নলিনীকান্ত সরকারকে নিবেদিত কবিতায় তাঁকে তাঁর বন্ধু, সুহৃদ ও দুঃখের দিনের সাথীরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়,

বন্ধু আমার! পরমাত্মীয় দুঃখ-সুখের সাথী,
তোমার মাঝারে প্রভাত লভিল আমার তিমির রাতি ।

নজরুলের দুঃখের দিনে যে নলিনী তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার শিল্পিত স্বীকৃতি,

চারিদিক হতে বর্ষেছে শিরে অবিশ্বাসের গ্লানি,
হারিয়েছি পথ–আঁধারে আসিয়া ধরিয়াছ তুমি পাণি।
চোখের জলের হয়েছ দোসর নিয়েছ হাসির ভাগ,
আমার ধরায় রচেছে স্বর্গ তব রাঙা অনুরাগ।

তিনি ছিলেন হাসির গানের গায়ক। নজরুল লিখেছেন, অশ্রু তুষার গলে তাঁর হাসির গঙ্গা বয়েছে; তিনি নিজে শত দুঃখে থেকেও অন্যকে আনন্দ দিয়েছেন, হাসিয়েছেন। নজরুল *বাঁধন-হারা* তাঁকে উৎসর্গ করেছেন এই বলে,

তোমার হাসির কাশ-কুসুমের পার্শ্বে বহে যে ধারা,
সেই অশ্রুর অঞ্জলি দিনু, লহ এ 'বাঁধন-হারা'।

চৌদ্দ পংক্তির এ কবিতায় নলিনীকান্তের প্রতি নজরুলের কৃতজ্ঞতার অকৃপণ প্রকাশ ঘটেছে।

সিন্ধু-হিন্দোল

নজরুল *সিন্ধু-হিন্দোল* (১৯২৮) কাব্যগ্রন্থটি মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬) ও তাঁর বোন শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৯-৬৪)কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটিও দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সম্বোধন ছাড়াই লেখেন,

আমার এই লেখাগুলি
বাহার ও নাহারকে দিলাম-

এর ঠিক নিচে দ্বিতীয় ভাগে ১৯২৬ সালে (৩১ জুলাই) তাঁদের চট্টগ্রামের তামাকুমণ্ডিস্থ বাসায় (আজিজ মঞ্জিল) বসে লেখা একটি কবিতা উদ্ধৃত হয়। তাতে তিনি বাহারকে 'ফুলের দুলাল' ও নাহারকে 'আলোর দুলালী' বলে অভিহিত করেন। প্রথম স্তবকে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে লেখেন,

কে তোমাদের ভালো ?
'বাহার' আন গুলশানে গুল 'নাহার' আন আলো।
'বাহার' এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিমান।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯২৫ সালে কলকাতায় হবীবুল্লাহ বাহার নজরুলের সঙ্গে পরিচিত হন। সে সময়ে সেখানে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৯২৬ সালে (জুন) নজরুল তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী

হেমন্তকুমার সরকারসহ চট্টগ্রামে যান। কিছু দিন ডাক বাংলোয় থেকে হেমন্ত কুমার কলকাতায় চলে গেলে নজরুল বাহারের নিমন্ত্রণে তাঁদের তামাকুমণ্ডিস্থ বাসায় ওঠেন। তাঁদের বিধবা মা আফিয়া খাতুন তাঁর দেখভাল করতেন।[২২] এখানে থাকাকালে তিনি বাহার ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে চট্টগ্রামের দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। এ সফর শেষে কলকাতায় ফিরে গিয়ে নাহারকে লিখিত দীর্ঘ পত্র থেকে এ–পরিবারে তাঁর আদর আপ্যায়নের চিত্র ফুটে ওঠে। চট্টগ্রামে বসেই তিনি *সিন্ধু-হিন্দোলের* অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন। এ সম্পর্ক–সূত্রে তিনি বাহার ও নাহারকে এটি উৎসর্গ করেন। এর পরেও তিনি দুবার (১৯২৯ ও ১৯৩১) চট্টগ্রামে যান এবং বাহারদের বাসায় ওঠেন। সম্বিতহারা অবস্থায় ১৯৭৩ সালে তাঁকে একবার চট্টগ্রামে নেয়া হয়।

সঞ্চিতা

১৯২৮ সালে (অক্টোবর) নজরুল ওই সময় পর্যন্ত লিখিত তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গানের সংকলন গ্রন্থ *সঞ্চিতা* বের করেন। এটি তিনি সে সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১) গণিতের মেধাবী ছাত্রী মিস ফজিলতুন্নেসা (১৯০৫-৭৬)কে উৎসর্গ করার মনস্থ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর অনুমতি চেয়ে তিনি তাঁকে পত্র লেখেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনো উত্তর পান নি। সম্ভবত তাঁর কাছে সে পত্র পৌঁছে নি (তাঁর শিক্ষক ও নজরুলের বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) কাছে পত্রটি পাওয়া গেছে)। পরে তিনি এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন,

> বিশ্বকবি সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
> শ্রীশ্রী চরণারবিন্দেষু।

বাল্যকাল থেকেই নজরুল ছিলেন রবীন্দ্র-প্রতিভায় মুগ্ধ। তাঁর গানের বাণী ও সুরে তিনি ছিলেন আকৃষ্ট। কৈশোর উত্তীর্ণ নজরুলের মুখস্থ ছিল অনেক রবীন্দ্র-সংগীত। সময় সুযোগ মতো তিনি সেগুলো গাইতেনও। করাচী-ফেরত নজরুলের বাক্স-পেটরায় অন্যান্য বই-পত্র-পত্রিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের একখানা স্বরলিপি গ্রন্থও পাওয়া গেছে। ১৯২১ সালের কোনো একসময়ে নজরুল কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও পরিচিত হন। ১৯২২ সালে তাঁর সম্পাদিত *ধূমকেতুর* জন্যে রবীন্দ্রনাথ একটি আশীর্বাদধর্মী কবিতা লিখে দেন। নজরুল জেলে অনশন করলে রবীন্দ্রনাথ তা ভাঙার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে "Give up hunger strike, Our literature claims you" বলে তারবার্তা প্রেরণ করেন–যদিও জেল–কর্তৃপক্ষ তা তাঁর কাছে পৌঁছায় নি। এ বন্দি অবস্থায়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য লিখিত গীতিনাট্য *বসন্ত* (১৯২৩) কবি স্বীকৃতিসহ তাঁকে উৎসর্গ করেন ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪)কে দিয়ে তা জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। ১৯২৫ সালে (ডিসেম্বর)নজরুলের পরিচালনায় *লাঙল* বের হলে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট কবিতায় তাঁকে আশীর্বাদ জানান। ১৯২৭ সালে (ডিসেম্বর) রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতায় 'খুন' শব্দ সম্পর্কিত মন্তব্যে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝলেও প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)-র মধ্যস্থতায় অচিরাৎ তার অবসান ঘটে। এর পরপরই নজরুল তাঁর *সঞ্চিতা* গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেন।

বুলবুল

তৎকালীন বিখ্যাত সংগীত শিল্পী দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০)কে নজরুল তাঁর *বুলবুল* (নভেম্বর ১৯২৮) গীতিগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। দিলীপ কুমার রায় ছাত্র জীবনেই সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে ব্রিটেন ও জার্মানিতে গিয়ে সংগীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে এসে (১৯২২) তিনি ওস্তাদ আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ ও পণ্ডিত ভাত খণ্ড প্রমুখের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন। সংগীত সাধনা-সূত্রে নজরুলের সঙ্গে দিলীপের পরিচয় ঘটে এবং সে পরিচয় দিনে দিনে গভীর বন্ধুত্বে রূপ নিয়ে, আমৃত্যু অক্ষুণ্ন থাকে।

১৯২৭ সালে (ফেব্রুয়ারি) সংগীত বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপে যাবার প্রাক্কালে নজরুল তাকে উদ্দেশ করে 'সুর-কুমার' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন। আবার সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে রচনা করেন 'সুরের দুলাল' শীর্ষক কবিতাটি। এ থেকে দিলীপের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি নজরুলের আর্কষণ ও অনুরাগ স্পষ্ট হয়।

তখন থেকে নজরুল সংগীতের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। নজরুলের গান রচনার সূচনা পর্বেই দিলীপ কুমার তা জনপ্রিয়করণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর অনেক গানের স্বরলিপিও করেন। এ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও কৃতজ্ঞতাবশে নজরুল তাঁকে *বুলবুল* গীতিগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এ সম্পর্কে দিলীপ কুমার রায় নিজে লিখেছেন, "এ গানটি ['বাগিচায় বুলবুলি তুই'] একদা আমার 'রাঙা জবা কে দিল মোরে পায়ে মুঠো মুঠো'-র মতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই গানটির জন্যই ও আমাকে ওর গজল গীতিগুচ্ছ 'বুলবুল' উৎসর্গ করে।।"[২৩] 'উল্লেখ্য, দিলীপ কুমার রায় নজরুলের এ গজল গানটি সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ হয়ে গেয়ে বেড়াতেন।

নজরুলের এ উৎসর্গপত্রটিও দু'ভাগে বিভক্ত : সম্বোধন অংশ ও কবিতা অংশ। সম্বোধন অংশে তিনি লেখেন,

সুর-শিল্পী, বন্ধু
দিলীপ কুমার রায়
করকমলেষু–

কবিতাংশে প্রধানত তাঁর গানের প্রচারে ও জনপ্রিয়করণে দিলীপ কুমারের ভূমিকা কৃতজ্ঞ চিত্তে তুলে ধরেছেন,

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান,
তুমি তারে দিলে রূপ রাঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ।
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুলবুলি,
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি'।

নজরুল আপন মনে একাকী নির্জনে যে গানের বাণী রচনা করেছেন দিলীপ কুমার যে সর্বত্র সে গানের বাণী ও সুর ছড়িয়ে ছিলেন তার সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি চিত্তের ঔদার্যে মুদ্রাঙ্কিত,

যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তারে সব বুকে, সবখানে।

এসময়ে দিলীপ কুমার সন্ন্যাস নিয়ে পণ্ডিচেরীর আশ্রমে চলে যান (এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সেখানে থাকেন)। তাতে নজরুল ব্যথিত হন যেমন ব্যথিত হন অনেকেই, "আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হয়ে।" সেখানে দিলীপের সঙ্গে নজরুলের 'বুলবুলি' তথা দিলীপের কণ্ঠে গীত গানও চলে গেছে। তিনি যেন তাকে সাদরে গ্রহণ করেন সে অনুরোধ করেছেন নজরুল।

তোমার কাননে উড়ে গেল মোর বাগিচার বুলবুলি-
বড় ভীরু সে যে, দোস্ত, তাহারে দস্তে লইও তুলি'।

এ উৎসর্গপত্রে নজরুল নিজেকে দিলীপ কুমারের 'প্রতিভা ও প্রাণমুগ্ধ' বলে উল্লেখ করেছেন,

তোমার প্রতিভা ও প্রাণমুগ্ধ নজরুল।

চক্রবাক

নজরুল *চক্রবাক* (আগস্ট ১৯২৯) কাব্যগ্রন্থটি শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৭৭-১৯৪৪)কে উৎসর্গ করেন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন একাধারে কবি, সংগীত-রসিক ও শিক্ষাবিদ। বিশের দশকের কোনো এক সময়ে তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *শতপর্ণী সনেট* ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। পরে তিনি আরো চার–পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ বের করেন। তাঁর বাড়িতে গান-বাজনার আসর বসতো। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলার অনুরাগী।

নজরুল ১৯২৮ সালে ঢাকায় অবস্থানকালে কিছু দিন 'রমনা হাউসে' সুরেন্দ্র-দম্পতির মেয়ে উমা মৈত্র (নোটন)কে গান শেখান। সুরেন্দ্র-দম্পতি প্রথম দিনই তাঁকে আপন করে নেন। সুরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লেখা উৎসর্গপত্রের সম্বোধন অংশে ও কবিতা অংশে সুরেন্দ্রনাথের চারিত্রিক ঔদার্য ও নজরুলের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে। সম্বোধন অংশে তিনি লিখেছেন,

বিরাট-প্রাণ কবি, দরদী
প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রী চরণারবিন্দেষু–

কবিতা অংশে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখার স্মৃতি ও তাঁর গুণাবলি আলোচনা করেছেন,

দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গ ধাম।
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
হে বিরাট, মহাপ্রাণ কেন বারে বারে
মনে হল এতদিনে দেখিনু দেবতা।

সুরেন্দ্রনাথকে কেন তিনি কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন তার কার্যকারণ সূত্র এ কবিতা থেকেই উদ্ধার করা যায়। তিনি তাঁকে স্নেহ-মায়া ভালোবাসায় কাছে টেনে নিয়েছেন, তাঁর ব্যথায় সমব্যথী হয়েছেন। তাঁর কথায়,

চলিতে চলিতে পথে দূর পথচারী,
আসিলাম তব দ্বারে, বাহু আগুসারি',
তুমি নিলে বক্ষে টানি', কহ নাই কথা,
না কহিতে বুঝেছিলে ভিখারীর ব্যথা।
মুছায়ে পথের ধূলি অফুরান স্নেহে
নিন্দা-গ্লানি-কলঙ্কের কাঁটা-ক্ষত দেহে
বুলাইলে ব্যথা-হরা স্নিগ্ধ শান্ত কর,
দেখিনু দেবতা আছে আজো ধরা পর।

তিনি সে সকল ভুলতে পারেন নি,ভুলি নাই, হে উদার, তব সেই দান। নজরুল 'ভগ্নপক্ষ চক্রবাক' হয়ে তাঁর শুভ্র বালু চরে উড়ে এসেছিলেন, আবার নির্বাক হয়ে উড়ে গেছেন এক সময়ে। তিনি আশা করছেন তাঁর এ গীতি শুনে হয়তো তাঁর মনে সেই স্মৃতি জেগে উঠবে। তিনি ভালোবাসার প্রতিদানে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে *চক্রবাক* উৎসর্গ করেছেন,

ভালোবেসে দিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে গান তোমারি পায়ে তাই দিনু দান।

সন্ধ্যা

এ বছরেই প্রকাশিত নজরুল তাঁর *সন্ধ্যা* (আগস্ট ১৯২১) কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন মাদারীপুরের বিপ্লবী দল 'শান্তি সেনাদল' ও তার প্রধানকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন,

মাদারীপুর "শান্তি সেনা"
কর-শত দলে
ও
বীর সেনানায়কের
শ্রী চরণাম্বুজে।

এখানে উল্লিখিত বীর সেনানায়ক হলেন শ্রী পূর্ণচন্দ্রদাস (১৮৮৯-১৯৫৬)। মাদারীপুরের ছেলে পূর্ণচন্দ্র দাস বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কাজে জড়িয়ে পড়েন। অল্প কিছুকাল পরেই তিনি মাদারীপুরে নিজস্ব বিপ্লবী দল 'মাদারীপুর শান্তি সেনা' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর অধ্যক্ষ বা পরিচালক পদে আত্মবৃত হন। বালেশ্বর ট্রেঞ্চযুদ্ধে (১৯১৫) বাঘা যতীনের (১৮৮০-১৯১৫) চার সহযোদ্ধা ছিলেন এ দলেরই সক্রিয় সদস্য।

১৯১৩ সালে তিনি ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হন। কিছুদিন পর মুক্তি পেলেও ১৯১৪ সালে ভারতরক্ষা আইনে আবার গ্রেফতার হন। এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলে থাকেন।[২৪]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ায় তিনি আবার গ্রেফতার হন। এ গ্রেফতার সম্পর্কে নজরুলের *ধূমকেতু* (১৯২২) পত্রিকা এক বাক্যে এক রিপোর্টে লেখে, "মাদারীপুরের পূর্ণ দাস ঢাকা জেলে অসুস্থ"।[২৫] এ বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার কিছু দিন পর তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়।

বহরমপুর জেলে বন্দি থাকাকালে (১৯২৩) সহবন্দি পূর্ণচন্দ্র দাসের সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁর অনুরোধে জেলে বসেই নজরুল একটি নাটক রচনা করেন বলে জানা যায়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সে নাটকটি পাওয়া যায় নি।

১৯২৩ সালের ২০ জুলাই *বিজলী* পত্রিকায় নজরুলের 'জাত জালিয়াত' কবিতাটির ফুটনোটে লেখা হয়, "মাদারীপুর সেনা দলের জন্য লিখিত অপ্রকাশিত নাটক হতে।"[২৬] নজরুল-পরিচালিত *লাঙলের* রিপোর্টে অন্য বন্দিদের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র দাসের নামও উল্লিখিত হয়, "১৮১৮ সালের বঙ্গীয় আইন অনুসারে নিম্নলিখিত ১৭ জন বাঙালি যুবক ধৃত হইয়া আটক আছেন। [...] পূর্ণচন্দ্র দাস ৮ই মার্চ ১৯২৪, ২ বৎসর"।[২৭] এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি উপলক্ষে নজরুল তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লেখেন 'পূর্ণ-অভিনন্দন' শীর্ষক গীতিকবিতাটি। এটি সে সময়ে *বিজলী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে টীকায় উল্লেখ করা হয়, "মাদারীপুর শান্তি–সেনা বাহিনীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষে রচিত।" এ কবিতায় ব্রিটিশ রাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়ার অভিযোগে *বিজলী*র কর্তৃপক্ষ ও নজরুলকে অভিযুক্ত করার উদ্যোগ-মুহূর্তে *বিজলী*-সম্পাদক শ্রী নলিনীকান্ত সরকারের হস্তক্ষেপে তা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।[২৮] এর পরেও পূর্ণচন্দ্র দাস তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। উপযুক্ত পটভূমিকায় নজরুল ১৯২১ সালে তাঁর সেনাদল ও তাঁকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে তাঁর নিজের সৎ সাহস ও রাজনৈতিক আদর্শ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

চোখের চাতক

নজরুল তাঁর *চোখের চাতক* (ডিসেম্বর ১৯২৯) গীতিগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন শ্রীমতী প্রতিভা সোম (পরে, ১৯৩৭ সাল থেকে, প্রতিভা বসু)কে। প্রতিভা বসু ছিলেন ঢাকার আশুতোষ সোমের মেয়ে। তাঁর ডাক নাম ছিল 'রাণু'। নজরুল ১৯২৮ সালে ঢাকায় অবস্থানকালে সুরেন্দ্রনাথের মেয়ে নোটনের সঙ্গে সঙ্গে রাণুকেও গান শেখান। কাজী মোতাহার হোসেনের বর্ধমান হাউজস্থ বাসা (বর্তমান বাংলা একাডেমী) থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বনগ্রামস্থ রাণুর বাসায় গিয়ে গান শেখাতে থাকেন। ৭ আষাঢ় (১৩৩৫) রাণুর বাসায় বসে 'শ্রী মতি রাণু সোম কল্যাণীয়াসু' সম্বোধন ক'রে ছোট একটি কবিতা লিখে দেন। একদিন (২৪ জুন) গান শেখানো শেষ ক'রে রাত দশটায় ফেরার পথে পাড়ার গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলেরা তাঁকে আক্রমণ করে।

এ ঘটনার পরে ঢাকা থেকে নজরুল কলকাতায় ফিরে যান। ক' মাস পরে প্রতিভা সোম কোলকাতায় গিয়ে তাঁর কাছে আবার গান শেখেন। এখানে নজরুলের প্রশিক্ষণে তিনি তাঁর দু'খানা গান রেকর্ড করান। কোম্পানির কর্তাকে বলে তিনি নজরুলকেই তাঁর গানের প্রশিক্ষক নিযুক্ত করেন।[২৯] কলকাতা বেতারেও নজরুলের গান প্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নজরুল তাঁর কণ্ঠে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে *চোখের চাতক* উৎসর্গ করেন,

কল্যাণীয়া বীণা কণ্ঠী
শ্রীমতি প্রতিভা সোম
জয়যুক্তাসু —

রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ

নজরুলের দ্বিতীয় ছেলে কাজী অরিন্দম খালেদ ওরফে বুলবুল (১৯২৬-১৯৩০) ছিল বুদ্ধিদীপ্ত ও সুন্দর চেহারার অধিকারী। তার প্রতি ছিল নজরুলের সীমাহীন স্নেহ ও ভালোবাসা। শুধু তাই নয়, —পরিবারের অন্যরাও তার প্রতি অনুরূপ স্নেহ-ভালোবাসা পোষণ করতেন। তার সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন,

> একটি ক্ষুদে যাদুকর ছিল সে। নজরুলের বন্ধুদের সঙ্গে সে চলে যেত এবং তাদের বাড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আবার নিজের বাড়ীতে ফিরে আসত। অদ্ভুত ছিল তার স্মরণ শক্তি।[৩০]

এ ফুটফুটে বালক বসন্তে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলে নজরুল তার পাশে বসে *রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ* (জুলাই, ১৯৩০)-এর গজলগুলো অনুবাদ করতে থাকেন। বহু চেষ্টা ক'রেও বুলবুলকে আরোগ্য করা যায় নি। ৭ মে ১৯৩০ সে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার এ মৃত্যু নজরুল মানসে গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী শোকের সৃষ্টি করে।

মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যেই প্রকাশিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* শীর্ষক অনূদিত গীতিগ্রন্থটি তিনি বুলবুলকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গপত্রে আবেগ আপ্লুত ভাষায় তিনি লেখেন,

> বাবা বুলবুল
>
> তোমার মৃত্যু শিয়রে বসে বুলবুল-ই-শিরাজ হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি, উড়ে গেছ। যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর?
>
> জানি না তুমি কোথায়। যে লোকেই থাক, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার এই দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ ক'রো। তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুলবুলিকেও বিস্ময়ান্বিত করে তুলবে।

নজরুল–গীতিকা

নজরুল তাঁর গানের সংকলন গ্রন্থ *নজরুল গীতিকা* (সেপ্টেম্বর ১৯৩০) তাঁর গানের শিল্পীদের উৎসর্গ করেন। তাতে কারো নাম উল্লেখ না-করে তিনি উৎসর্গপত্রে লেখেন,

আমার গানের বুলবুলিরা।

স্মর্তব্য, ১৯৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর গানের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন—মানিক মালা, কে. মল্লিক, দিলীপ কুমার রায়, প্রতিভা সোম, ধীরেন দাস, আঙ্গুর বালা, ইন্দু বালা, হরিমতী, কমলা ঝরিয়া, কাননবালা প্রমুখ। তাঁরাই ছিলেন নজরুলের 'গানের বুলবুলি'। তাঁদের উদ্দেশ্যেই তিনি উৎসর্গপত্রে লেখেন,

তোমাদেরি সুর, সোহাগে
তোমাদেরি অনুরাগে
আমার কাঁটা কুঞ্জে আজো
সন্ধ্যা মণি গোলাব জাগে।

তোমাদেরে নজরানা দিই
সেই কুসুমের গন্ধ গীতি,
শিশির সম জড়িয়ে থাকুক
আমার গানে সবার স্মৃতি।

চন্দ্রবিন্দু

পুত্র বুলবুলের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান থেকেও নজরুল *চন্দ্রবিন্দু* (সেপ্টেম্বর ১৯২৯) কাব্যগ্রন্থের হাস্যব্যঙ্গ-রসাত্মক কবিতাগুলো লেখেন। তিনি এ কাব্যগ্রন্থের চারিত্র্যধর্মের প্রতি লক্ষ রেখেই হাস্য-রসাত্মক স্বভাব কবি শ্রী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (১৮৮৯-১৯৬৮) কে এটি উৎসর্গ করেন। তাতে তিনি তাঁকে 'মদ্দাঠাকুর' বলে বিশেষিত করেন।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের আসল নাম বিনয় কুমার মল্লিক হলেও 'শরৎচন্দ্র পণ্ডিত' ছদ্মনামে লিখে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেন। পরিচিত ও ঘনিষ্ঠজনরা তাঁকে 'দাদা ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতেন। স্কুল-জীবন থেকেই তিনি হাস্যরসাত্মক, চটুল ও ব্যঙ্গকাব্য রচনা ক'রে সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৩১] কর্মজীবনে তিনি 'পণ্ডিত প্রেস' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে *জঙ্গীপুর সংবাদ* বের করেন। এতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংগতিগুলোকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। *জঙ্গীপুর সংবাদ* ছাড়াও তিনি *বিদূষক* নামে আরেকটি পত্রিকা বের করেন। এটি ছিল আগাগোড়া পদ্যে রচিত। রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং তিনি। *বিদূষক* কলকাতায় ফেরি করার জন্যে তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ অফিসার (১৯২৪-২৫) সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) তাঁকে নিজ ব্যয়ে লাইসেন্স করে দেন। এ সময়ে *বোতল পুরাণ* নামে আরো একটি পত্রিকা বের করেন তিনি। এটিও ছিলো লঘু রসের পত্রিকা। এসব পত্রিকা তিনি নিজেই ফেরি ক'রে বিক্রি করতেন।

তিনি সাধারণ স্কুল-কলেজে (এফ. এ. তে কিছুদিন পড়েছেন মাত্র) বেশি শিক্ষা লাভ না করলেও পাঠ্য বহির্ভূত বহু বিষয়ে ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরিহাস করার অসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর। মুখে মুখে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতেন তিনি। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দী, ব্রজবুলি ও মিশ্রিত ভাষায় ব্যঙ্গ বা কৌতুক কবিতা রচনা করতে পারতেন।[৩২] শুধু লিখিত বা মৌখিক কবিতায়ই নয়, বাক্যালাপেও তিনি রসের যোগান দিতে পারতেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তিনি স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য-কৌশলে অন্যকে আনন্দ দিতেন।

১৯২০ সালেই নলিনীকান্ত সরকারের মাধ্যমে মদ্দা ঠাকুরের সঙ্গে পল্টন-ফেরত নজরুলের পরিচয় ঘটে।[৩৩] এ পরিচয় পরে ঘনিষ্ঠ হয়।

নজরুলের সম্পাদনায় *ধূমকেতু* বের হলে মদ্দা ঠাকুর লেখেন "ধূমকেতু"র প্রতি বিষহীন ঢোঁড়ার অযাচিত আশীর্বাদ' শীর্ষক এক দীর্ঘতর কবিতা। তাতে তিনি লেখেন,

"ধূমকেতু"তে সওয়ার হয়ে
আসরে আজ নামলো কাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী।

অবশ্য কবিতাটি *ধূমকেতুতে* প্রকাশিত হয় নি। মদ্দা ঠাকুরের *জঙ্গীপুর সংবাদ* সরকারি বিজ্ঞাপন নির্ভর ছিল। ফলে তাঁর ক্ষতি হবে মনে করে *ধূমকেতুতে* এটি ছাপানো হয় নি।[৩৪]

মাতৃসমা বিরজা সুন্দরীর হাতে লেবুর রস পানে নজরুল অনশন ভঙ্গ করলে মদ্দা ঠাকুর তাঁকে উদ্দেশ ক'রে উল্লসিত চিত্তে *বিদূষক* পত্রিকায় লেখেন (১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০),

এত দিনে পরে কাজী
খাইতে হয়েছে রাজী,
মায়ের সোহাগে,
দেশের কথায়
জেদ ছাড়িয়াছে আজি।

চন্দ্রবিন্দু কাব্যগ্রন্থের এ উৎসর্গপত্রের দু'টি অংশ। প্রথম অংশ সম্বোধন। তাতে তিনি লিখেছেন,

পরম শ্রদ্ধেয়
শ্রীমদ্দা ঠাকুর
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের
শ্রীচরণ কমলে–

দ্বিতীয় অংশে দু' লাইনের কবিতায় মদ্দা ঠাকুরের মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখসহ তাঁকে নমস্কার জ্ঞাপন করেছেন,

হে হাসির অবতার
লহ গো চরণে ভক্তি প্রণত কবির নমস্কার।

উৎসর্গ সম্পর্কে শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত আবদুল আজীজ আল-আমানকে এক পত্রে (২৪-৪-৬৩) জানিয়েছেন,

> নজরুল আমাকে তাঁর "চন্দ্রবিন্দু" বইখানি উৎসর্গ করার সময় 'শ্রীমদ্দ ঠাকুর' লিখেছিল। তাতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। মদ্দা বলে মরদ বা পুরুষ লোককে। নজরুল তাও মনে করতে পারে। আমি ওটাকে মনে করেছিলাম শ্রীমৎ ঠাকুর। সন্ধিযোগ হয় 'শ্রীমদ্দা ঠাকুর' ক'রে উচ্চমানের রসিকতার পরিচয় দিয়েছে।[৩৫]

আলেয়া

একই বছর প্রকাশিত *আলেয়া* (১৯৩১) নাট্যগ্রন্থটি নজরুল নটরাজের সকল নট-নটীর নামে উৎসর্গ করেন। তাতে তিনি লেখেন,

নট-রাজের চির নৃত্য-সাথী
সকল নট-নটীর নামে
"আলেয়া" উৎসর্গ করিলাম।

আলেয়া গীতিনাট্য (অপেরা) টি ১৩৩৮ সালের ৩ পৌষ তারিখে কলকাতার নাট্য-নিকেতন রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। এতে ২৮টি গান ছিল। অভিনেতা-নেত্রীদের সঙ্গে নৃত্যশিল্পীরাও গানে অংশ নেন। পরে ঐ বছরই *আলেয়া* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

নজরুল-স্বরলিপি

নজরুল তাঁর *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১) গ্রন্থটি উমাপদ ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করেন। তাতে তিনি লেখেন,

গীতশিল্পী বন্ধু শ্রী উমাপদ ভট্টাচার্য এম. এ.
করকমলেষু—

উমাপদ ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করলেও আজীবন সংগীত সাধনা ক'রে যান। নজরুলের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গতা। উৎসর্গের ভাষা থেকেও তা বোঝা যায়।

১৯২৯ সালে (ডিসেম্বর) কলকাতার এলবার্ট হলে (১৮৭৬) নজরুলকে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে যে জাতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয় তাতে নলিনীকান্ত সরকার ও উমাপদ ভট্টাচার্য আবহ-সংগীত পরিবেশন করেন। ঐ সংগীতটির প্রথম অংশ ছিল এ রকম,

ঝটিকা ক্ষুব্ধ সরসীতে তুমি
সুন্দর সিত শত দল।
সঞ্চরে শ্যাম- সুষমাতে তব
অন্তরে সুধা পরিমল।

এর পূর্বে প্রকাশিত *বাঁধন-হারা* উপন্যাসটি তিনি নলিনীকান্ত সরকারকে উৎসর্গ করেন। এবার *নজরুল-স্বরলিপি* উৎসর্গ করেন উমাপদ ভট্টাচার্যকে।

বনগীতি

নজরুল তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগীতগ্রন্থ *বনগীতি* (অক্টোবর ১৯৩২) উৎসর্গ করেন ওস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁ (১৮৮৭-১৯৩০)কে। জমির উদ্দীন খাঁ ছিলেন ধ্রুপদী সংগীতের দক্ষ শিল্পী। পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি কলকাতায় এসে গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এখানে উর্দু, হিন্দী ও বাংলা গান গেয়ে তিনি জনপ্রিয়তা পান। এক সময়ে পুঁটিয়ার রানী তাঁকে তাঁর সভা-গায়ক পদে নিযুক্ত করেন।

কলকাতায় নজরুল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেই অনেক সুর, আলাপ ও রাগ-রাগিনী শেখেন। নজরুল তখন ৮/১ পান বাগান লেনে থাকতেন। নানা ধরনের লোকজনের আগমনে তাঁর বাড়িটি মুখর থাকতো। ওস্তাদ জমির উদ্দীনও এখানে আসতেন মাঝে-মাঝে।[৩৬]

জমির উদ্দীন খাঁ এইচ. এম. ভি. গ্রামোফোন কোম্পানির চীফ ট্রেনার ছিলেন। নজরুল ছিলেন তাঁর সহকারী ও হেড কম্পোজার। তিনি পাঞ্জাবী হলেও বাংলার প্রতি ছিল অশেষ অনুরাগ। সে কারণে তিনি নিজেকে 'বাঙালি' বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও (১৯২৭) তে তিনি অনেক বাংলা গানও গেয়েছেন। নজরুল ছাড়াও গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-৫৯), আঙ্গুর বালা, ইন্দু বালা, কমলা ঝরিয়া (১৯০৬-৭৯) প্রমুখ তাঁর যোগ্য শিষ্য ছিলেন।

ওস্তাদ জমির উদ্দীনের উদার ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্রে নজরুল আকৃষ্ট হন। তাঁর মৃত্যুর (২৬ নভেম্বর ১৯৩৯) পর শোক সভায় (১০ ডিসেম্বর) সভাপতির ভাষণে নজরুল তাঁর সম্পর্কে বলেন, "জমির উদ্দীন পাঞ্জাবী ছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে।"[৩৭] তাঁর নামে গীতিগ্রন্থটি উৎসর্গকরণে নজরুলের এ দৃষ্টিভঙ্গিই সক্রিয় ছিল।

এ উৎসর্গপত্রটিও দু'ভাগে বিভক্ত : শিরোনাম অংশ ও কবিতা অংশ। শিরোনাম অংশে জমির উদ্দীন খাঁর মূল পরিচয় ও নজরুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দিক উন্মোচিত হয়েছে,

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কলাবিদ
আমার গানের ওস্তাদ
জমীর উদ্দীন খান সাহেবের
দস্ত মোবারক —

কবিতা অংশে তাঁর স্তুতি ও গুণকীর্তন করে বলা হয়েছে,

তুমি বাদশাহ্ গানের তখ্ত নশীন্,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজনু প্রেম-রঙ্গিন।
কণ্ঠে তোমার স্রোতস্বতীর উছল-গীতি,
বিহগ-কাকলি, গন্ধ গর্ব-লোকের স্মৃতি।
সাগরে জোয়ার সম তব তান শান্ত উদার,
হৃদয়ের বেলাভূমে নিশিদিন ধ্বনি শুনি তার।

তাঁর কাছে সুরগুলো 'পোষাপাখীর মত' ধরা দিতো। সুরগুলো যেন তাঁর হাতে স্বতঃস্ফূর্ততা পেতো। এ 'সুর-ওস্তাদ'কে নজরুল এ বলে তাঁর *বনগীতি* উৎসর্গ করেছেন,

সুর-শা'জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,
মোর "বনগীতি" নজরানা দিয়া দস্ত চুমি—

১৩ অক্টোবর (১৯৩২) এ উৎসর্গপত্রযোগে *বনগীতি* গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে। নজরুল তখন কলকাতার ৫৩ জি হরঘোষ স্ট্রীটে থাকতেন।

গুল–বাগিচা

নজরুল তাঁর *গুল-বাগিচা* (জুন ১৯৩৩) গীতিগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন শ্রীজিতেন্দ্র নাথ ঘোষকে। জিতেন্দ্র ছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী। পাকা ব্যবসায়ী হলেও সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতিতে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। নজরুল নিজে কবি, গায়ক, গীতিকার। জিতেন্দ্রের ব্যবসা এগুলো নির্ভর। এ-সূত্রে জিতেন্দ্রের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব। খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের

ভাষ্যমতে, "জিতেন্দ্র পাকা ব্যবসায়ী হলেও উদার ও ভদ্র ছিলেন। তিনি গুণীর কদর করতে জানতেন। তিনি নজরুলকে সব রকম সুবিধা দিয়ে যেমন গুণের মর্যাদা দিচ্ছিলেন, অন্যদিক দিয়ে তাঁর নিজের ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিরও চেষ্টা করেছিলেন"।[৩৮] নজরুলের লেখা উৎসর্গপত্রের ভাষা থেকে তাঁদের সম্পর্কের স্বরূপ ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত।

এ উৎসর্গপত্রেরও দু'টো অংশ : সম্বোধন অংশ ও কবিতা অংশ। সম্বোধন অংশে জিতেন্দ্রের পরিচয় ও নজরুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে,

(স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী)
আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু
শ্রী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ
অভিন্ন হৃদয়েষু

কবিতা-অংশে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁর চরিত্রের ঔদার্য বর্ণিত হয়েছে,

বন্ধু আমায় বাঁধিয়াছ তুমি অশেষ ঋণে,
দুঃসময়ের দুর্যোগ রাতে দারুণ দিনে।
তোমার ঝরনা নির্ঝরিণীর স্রোতের সম
নামিয়া এসেছে রৌদ্র-দগ্ধ মরুতে মম।

জিতেন্দ্রের রেকর্ড কোম্পানি যে নজরুলের গানের বিকাশে সহায়তা করেছে, তিনি যে তাতে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সে-কথা উল্লেখে বাঙ্ময় তিনি,

বিরাট তোমার প্রাণের ছায়ায় জুড়াতে পেয়ে
ঘুমন্ত মোর গানের বিহগ উঠেছে গেয়ে
তেমনি করিয়া, গাহিত যেমন প্রথম প্রাতে;–

বিত্তশালী হয়েও তিনি চিত্তের চর্চা করেছেন। বিত্ত তাঁকে আড়াল করতে পারে নি, নজরুলের ভাষায়, "বিত্ত তোমার রোধিতে পারেনি চিত্ত গীতি"। নজরুল গানের সওদা করতে এসে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর দানের কথাটি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন তিনি, "দিয়াছ অনেক, চাহনি কিছুই করনি হিসাব"। নজরুলের মতে, তিনিও তাঁর মতো 'বেহিসাবী'। এ স্বভাবগুণেই দু'জন দু'জনের বন্ধু হতে পেরেছেন। তিনি তাঁর প্রতি এমনই কৃতজ্ঞচিত্ত যে, বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তাঁকে দেবতার আসনে বসাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি এবং সে-সূত্রেই তিনি তাঁকে "গুল-বাগিচা" উৎসর্গ করেন।

দেবতার ঋণ শুধিতে কি পারে মানুষ কভু ?
গুল-বাগিচা'র পুষ্পাঞ্জলি দিলাম শুধু।

পুতুলের বিয়ে

পুতুলের বিয়ে (এপ্রিল ১৯৩৩) শিশুতোষ নাটিকা। এটি নজরুল তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ ছেলে সানি (১৯২৯-৭৪) ও নিনি (১৯৩৯-৭৯)কে উৎসর্গ করেন,

'সানি ও নিনি কল্যাণীয়েষু

সানির ভালো নাম ছিল কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও নিনির ভালো নাম ছিল কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম। নজরুল চীন প্রজাতন্ত্রের (১৯১১) প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী নেতা সানিয়াৎ সেনের (১৮৬৬-১৯২৫) অনুকরণে তাঁর তৃতীয় ছেলের নামকরণ করেন 'সানি'। অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার (১৯১৭) প্রতিষ্ঠাতা ও বিপ্লবী নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) নামের অনুকরণে তিনি তাঁর চতুর্থ ছেলের নামকরণ করেন 'নিনি'। এ দু'টি শিশু সন্তানকে নজরুল তাঁর শিশুতোষ নাটিকা *পুতুলের বিয়ে* উৎসর্গ ক'রে অপত্য স্নেহের পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে কাজী সব্যসাচী আবৃত্তি শিল্পী ও কাজী অনিরুদ্ধ গীটার বাদকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

কাব্য আমপারা

কবি-জীবনের শুরু থেকেই নজরুলের আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও ভারতীয় হিন্দু-পুরাণের অবাধ ব্যবহারে বাংলাদেশের রক্ষণশীল মুসলমান ও একশ্রেণীর মোল্লা-মৌলবী-মাওলানা তাঁর প্রতি বিরূপ-বিতৃষ্ণ হয়ে 'কাফের' ফতোয়া দেয়। *ধূমকেতু* সম্পাদনাকালে তাদের নজরুল-বিরোধিতা ও সমালোচনা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে নজরুলের বিদ্রোহাত্মক ও হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ধর্মী কথাবার্তা কিছুটা গা সওয়া হলেও তাদের নজরুল-বিরোধিতা অব্যাহতই থাকে। নজরুল মুসলমানদের রক্ষণশীলতা ও এক শ্রেণীর মোল্লা-মৌলবী-মাওলানার গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার সমালোচনা করেন। ১৯৩২ সালে (নভেম্বর) সিরাজগঞ্জে 'মুসলিম তরুণ সংঘে'র (১৯৩০) সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণেও তিনি তাদের রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার তীব্র সমালোচনা করেন। এ শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি ঐ অভিভাষণে বলেছেন, "মৌলানা-মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।"[৩৯] এ থেকে বোঝা যায়, খাঁটি ধর্মপ্রাণ ও প্রকৃত আলেমদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এ সময় তিনি কোরানের ৩০তম অধ্যায় *কাব্য আমপারা* (নভেম্বর ১৯৩৩) নামে বাংলায় পদ্যাকারে অনুবাদ করেন। এ অনুবাদে তাঁকে নানাদিক থেকে সহযোগিতা করেন মাওলানা মোহাম্মদ মোমতাজ উদ্দীন ফখরোল মোহাদ্দেসীন সাহেব, মাওলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ (পাবনবী) সাহেব, মিঃ ইস্কান্দার গজনবী বি. এ. সাহেব, মৌলবী কে. এম. হেলাল সাহেব ও আরো অনেকে।[৪০] এটি প্রকাশের দায়িত্ব নেন মেসার্স করিম বখ্শ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মাওলানা আবদুর রহমান খান। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে, অর্থে ও সাহায্যে নজরুল এ অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরেছেন। সে-সূত্রে তিনি তাঁর এ *কাব্য আমপারা* গ্রন্থটি 'বাঙলার নায়েবে-নবী মৌলবী সাহেবানদের দস্ত্ মোবারকে' উৎসর্গ করেন।

গানের মালা

তিনি পরের বছর প্রকাশিত *গানের মালা* (১৯৩৪) গীতিগ্রন্থটি শ্রী অনিলকুমার দাসকে উৎসর্গ করেন। অনিলকুমার ছিলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্রের শিল্পী। তিনি প্রধানত রবীন্দ্র-

সংগীত গাইতেন; কোনো কোনো অনুষ্ঠানে ধারা বিবরণীও দিতেন। উৎসর্গপত্রের সম্বোধন অংশে নজরুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বরূপ স্পষ্টত প্রকাশিত,

পরম স্নেহভাজন
শ্রীমান অনিলকুমার দাস-
কল্যাণীয়েষু—

সম্বোধন অংশের পর অনিলকুমার দাসকে নিবেদিত বিশ পংক্তির কবিতায় নজরুলকে গানের জগতে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তিনি অজ্ঞাত বাসে ছিলেন; তাঁকে অনিল ডেকে এনেছেন সংগীতের জগতে।
এ কৃতজ্ঞতা বশে তিনি তাকে *গানের মালা* উৎসর্গ করলেন,

তোমার আদরে যে ফুল গুলিরে
ফুটাইয়া তুলেছিনু নিরালা,
তাই দিয়া গাঁথি দিলাম তোমারে
আশিস আমার "গানের মালা"।

নজরুলের উপর্যুক্ত উৎসর্গপত্রগুলোতে নজরুল মানসের পরিচয় ভিন্নবর্গে বিন্যস্ত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যের মতো তাঁর এসব উৎসর্গপত্রেও আবেগ ও আদর্শ সমান সক্রিয় ছিল। আবেগে, আন্তরিকতায় ও শৈল্পিক নির্মাণে নজরুলের উৎসর্গপত্র রূপোজ্জ্বল, প্রাণোজ্জ্বল। তাঁর এসব উৎসর্গপত্র বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

তথ্যনির্দেশ

১. রফিকুল ইসলাম, *নজরুল প্রসঙ্গে,* নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ৫২

২. মুজফ্‌ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা,* ৩য় সং, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ ৪৩

৩. অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ ৩৩৩

৪. আবদুল কাদির-(সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী* ১ম খণ্ড, নতুন সং, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ৭-২৫

৫. আনিসুজ্জামান (সংকলিত-সম্পাদিত), *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র,* বাংলাএকাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ৪১৬

৬. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, *কাজী নজরুল,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ ২০১

৭. কাজী নজরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *ধূমকেতু,* ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯২২, পৃ ১১

৮. ঐ, ৭ম সংখ্যা, পৃ ৭

৯. ঐ, ১০ম সংখ্যা, পৃ ৮

১০. ঐ, ১৩শ সংখ্যা, পৃ ১৭

১১. ঐ, ২০শ সংখ্যা, পৃ ৭

১২. ঐ, ষোড়শ সংখ্যা, পৃ ৫

১৩. সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল চরিতমানস,* নতুন সং, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ ৬১

১৪. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য*, কে. পি. বাগচী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ ১০৩-৪

১৫. রফিকুল ইসলাম : *নজরুল প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬-৪৭

১৬. মুজফ্ফর আহ্‌মদ, *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫

১৭. মুজফ্ফর আহ্‌মদ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ*, ৩য় সং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ ৭

১৮. অঞ্জলি বসু, পূর্বোক্ত, পৃ ৪১৪

১৯. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৩

২০. সুধীরকুমার মৈত্র, *পত্রপত্রিকার আলোকে নজরুল*, ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকতা, ১৯৯২, পৃ. ১০৩

২১. অমরেশ কাঞ্জিলাল (সম্পাদিত), *ধূমকেত*, ৩১শ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯২২, পৃ ৬

২২. মাহমুদ নুরুল হুদা, *চিরঞ্জীব নজরুল*, সুবর্ণ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ ১৭

২৩. বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত) ,*নজরুল-কথা*, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ ৮৭

২৪. অঞ্জলি বসু, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮৪

২৫. *ধূমকেতু*, ২০শ সংখ্যা, ১৯২২, পৃ ১৩

২৬. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল সংগীত প্রসঙ্গ*, নতুন সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ ৩৩৫

২৭. *লাঙল*, ১ম খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯২৬, পৃ ৭

২৮. নলিণীকান্ত সরকার, *শ্রদ্ধাস্পদেষু*, কলকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃ ১০

২৯. *দেশ*, ২৪শে মে, ১৯৮০, কলকাতা, পৃ ১৯

৩০. মুজফ্ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪৭

৩১. সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পদিত), *বাংলার মনীষী*, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ২৯৪

৩২. ঐ, পৃ ২৯৮

৩৩. আবদুল আজিজ আল আমান; *নজরুল পরিক্রমা*, ২য় সং, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ ৩৬৭

৩৪. ঐ, পৃ ৩৬৮

৩৫. ঐ, পৃ ৩৭১

৩৬. ঐ, পৃ ৩৫১

৩৭. আবদুল কাদির (সম্পাদিত); *নজরুল রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, নতুন সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ১১২

৩৮. খান মুহাম্মদ মঈনদ্দীন, *যুগ-স্রষ্টা নজরুল*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ ১৬৯

৩৯. আবদুল কাদির (সম্পাদিত); *নজরুল রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড পূর্বোক্ত, পৃ ৯৫

৪০. আরজ [ভূমিকা], *কাব্য আমপারা*।